স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা

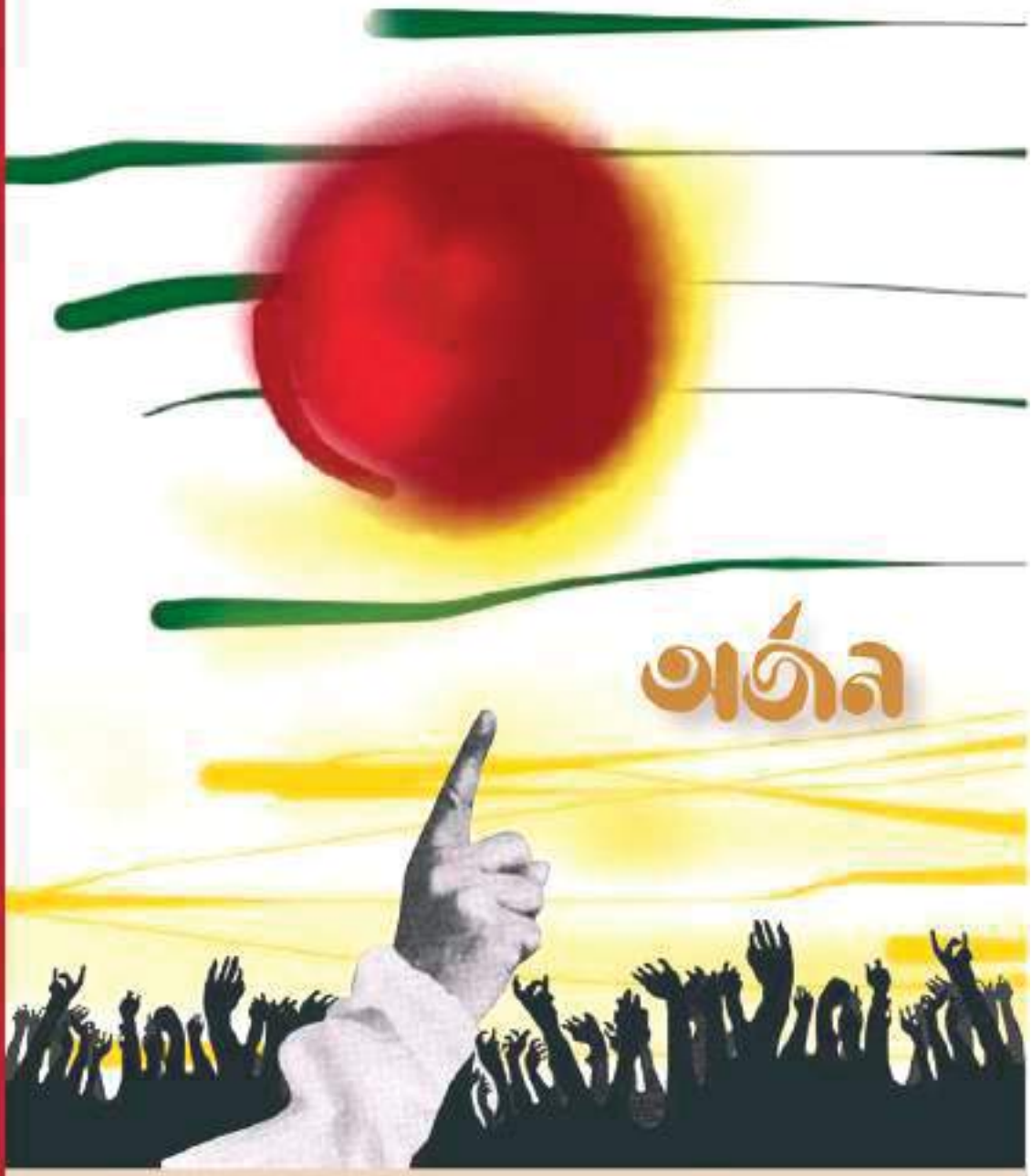

অর্জন

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ

১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৪. কন্যাশিশু-১৬, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, সম্পাদনায়- ড. বদিউল আলম মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯

১৫. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১২৯।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭২।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২১৫।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৯।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৩।

২০. দৈনিক সংবাদ, ০৯.০৫.২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

২১. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৩২০।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬৪।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪১৫।

২৪. কন্যাশিশু-১৬, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, সম্পাদনায়- ড. বদিউল আলম মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৬০-৬১।

২৫. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক- মেসবাহ কামাল; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৫৬।

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৭।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৮।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮৪।

২৯. কন্যাশিশু-১৬, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, সম্পাদনায়- ড. বদিউল আলম মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৫৯।

৩০. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক- মেসবাহ কামাল; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৩৪৯।

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৯৫।

৩২. বিপন্ন আদিবাসী কোল জনগোষ্ঠী, স্টেফান সরেন, নওরোজ প্রকাশনি, পৃষ্ঠা- ৫১

৩৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮

আকর গ্রন্থসমূহ:

১. মিথুশিলাক মুরমু, বীরগাঁথা মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২. আইয়ুব হোসেন ও চারু হক, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা।

মান্দি অঞ্চলের না বলা কিছু কথা

সঞ্জীব দ্রং

১. একাত্তরের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমরা 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার' অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম (দেখুন বাংলাদেশের সংবিধান)। মুক্তিযুদ্ধে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, আদিবাসী সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে আমাদের প্রিয় স্বদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে চলেছে, খাদ্য উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য, পোশাক শিল্পে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি, নারী শিক্ষায় সাফল্য, মাতৃমৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাস তথা এমডিজি অর্জন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ডিজিটালাইজেশন ইত্যাদিতে সাফল্য অর্জিত হলেও দেশের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের জীবনে মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আশানুরূপ অগ্রগতি স্বাধিত হয়নি। একটি কল্যাণকামী মানবিক রাষ্ট্রের দিকে পথচলার গতি খুব একটা গতিশীল হয়নি। বরং সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার বার বার আমাদের পেছনে ঠেলে দিয়েছে। এখনো কিভাবে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব রটিয়ে নিমিষেই সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, সম্পদ ও উপাসনাগৃহ ছারখার করে দেয়া যায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে। তাই সকলের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার সংগ্রাম এখনো চলমান আছে।

আমরা জানি, বিশ্বের সকল দেশেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ আছেন। আজ এখানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশ্বের অনেক দেশেই তারা সংখ্যালঘু নাগরিক। এই সংখ্যালঘু জনগণকে দেশে দেশে জাতীয় রাজনীতির নানা হিসাব-নিকাশের কারণে কঠিন সংকট মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। অনেকে সংখ্যালঘু হওয়ার দুঃখকে নিয়তি ভেবে জীবন পার করে দেন। এই কারণেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সালে একটি মাইনোরিটি ডিক্লারেশন গ্রহণ করে। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু জনগণের আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। সংখ্যালঘু মানুষের এই পরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্রকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

মহাত্মা গান্ধীসহ বিশ্বের অনেক মণিষী বলে গেছেন, একটি দেশ ও একটি সমাজ কত বেশি গণতান্ত্রিক, কত বেশি সভ্য ও উন্নত, তার বিচার্য বিষয় হলো সেই দেশে ও সেই সমাজে সংখ্যালঘু জনগণ কেমন আছেন। একটি জাতির মহত্ত্ব বা বিশালত্ব তখনি প্রকাশ পায়, যখন সেই জাতি অন্য সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জাতি মানুষের সঙ্গে মানবিক আচরণ করে।

সংখ্যালঘু জনজীবনে বিরাজিত বহুমুখী সংকট থেকে উত্তরণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল। যেমন:

- অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।
- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে।
- সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।
- সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

জাতিসংঘ এসডিজির মূলসুর নির্ধারণ করেছে, কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না বা লীভ নো ওয়ান বিহাইন্ড। অর্থাৎ সকলকে সাথে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে একটি মানবিক রাষ্ট্র ও একটি ইনক্লুসিভ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে।

২. আমাকে যখন বলা হলো পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে গারো অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তার ফলে সেখানে মানুষের জীবন সংগ্রাম, মান্দিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ, নানামুখী অনিশ্চয়তা, সরকারের ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের গোড়াপত্তন ইত্যাদি নিয়ে লিখতে হবে, তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার পর বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন, সেটি সংঘটিত হয়েছিল মেঘালয় সীমান্ত বরাবর গারো পাহাড় অঞ্চলে। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পঁচাত্তর পরবর্তী এই সংগ্রামের বিবরণ বা এই সব নিয়ে বড় কোনো লেখা বা কোনো বই খুঁজে পাইনি। এই

নিয়ে কারোর উল্লেখ করবার মতো স্মৃতিচারণামূলক লেখাও পাইনি। কাদের সিদ্দিকী রচিত প্রায় সবগুলো বই যা হাতে পেয়েছি, তাতেও এই নিয়ে তাঁর নিজের কোনো স্মৃতিচারণা দেখিনি। অনেক আশা নিয়ে তাঁর রচিত বই 'বজ্রকথন' ও 'না বলা কথা' উল্টেপাল্টে দেখেছি। না, এই দু'টি বইয়েও পচাত্তর পরবর্তী সময়ে তাঁর ভূমিকা বা কাজ নিয়ে কিছু লেখা পেলাম না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি স্বল্প সময়ের মধ্যে। টাঙ্গাইলের একজন খ্যাতিমান নাট্যকার ও অভিনেতার সঙ্গে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক ও যোগাযোগ। কোনো উপায় না পেয়ে তাঁকে বলেছি, তিনি এই বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে পারেন কিনা। পাইনি। আসলে নেই। কাদের সিদ্দিকী যে দলের প্রধান, সেই দলের শীর্ষ একজন নেতাকে আমার এক পরিচিত লেখকের মাধ্যমে যুক্ত করেছিলাম যদি কোনো তথ্য বা লেখা পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য, পাওয়া যায়নি। যে পত্রিকায় আমি কলাম লিখি, সেই প্রথম আলো'র একজন সিনিয়র সাংবাদিককে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁরও এমন কোনো বইয়ের খবর জানা নেই। হয়তো বা নানা হিসেব-নিকেশ বা টানাপোড়নের যোগ-বিয়োগে এই অধ্যায় নিয়ে উল্লেখযোগ্য কেউ লিখেননি। এত বড় একটি অধ্যায় নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখা না থাকা বা কোনো বই না থাকা আমাকে বিস্মিত করেছে। আর যদি থেকেও থাকে, তার দুষ্প্রাপ্যতা আমাকে ব্যথিত করেছে। সেই সংগ্রামের সঙ্গে যে তরুণ সমাজ যুক্ত ছিলেন আবেগে, জেনে বুঝে বা না জেনে না বুঝে, তাদের মধ্য থেকেও কেউ কি কিছু লিখেছেন? আগামী দিনের কোনো লেখক বা আগ্রহী গবেষক হয়তো আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

৩. তাই এই লেখা শুরু করতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেল। একবার ভেবেছিলাম, ফাদার তপনকে, প্রকাশনা কমিটিকে অনুরোধ করে বিষয়টি পরিবর্তন করবো। পরে অবশ্য ভাবলাম, আমি যদি অন্তত ইতিহাসের পাতা থেকে খসে পড়া অনালোচিত এই আলোচনা শুরু করি, তবে হয়তো আগামী দিনের তরুণ কোনো লেখক এই নিয়ে কাজে হাত দিতেও পারেন।

আমি যখন এই লেখা শুরু করবো ভেবেছি, তখন সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকার সম্পাদক ফাদার বুলবুলের কথা মনে পড়লো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ফাদার আবেল বি রোজারিও একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রতিবেশী প্রকাশনার জন্য যেখানে বিড়াইডাকুনি মিশনে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। প্রায় ১৮ মিনিটের ঐ সাক্ষাৎকারে ফাদার আবেল পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে বিড়াইডাকুনী মিশনে পাঁচবার কাদেরিয়া বাহিনীর হানা দেবার বর্ণনা দিয়েছেন। কত কষ্ট করেছেন তিনি সেই সময় মান্দিদের জন্য। তিনি একবার চলে গিয়েছিলেন মরিয়মনগর। তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট হয়, কাদেরিয়া বাহিনী খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহের জন্য মিশনে হানা দিত। সম্ভবত তাদের খাবারের দারুণ সংকট ছিল। তারা আরো অনেকের বাড়িতে লুটতরাজ চালিয়েছে। ফাদার আবেল বলেছেন, কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যদের জন্য খাদ্য সহায়তা ইত্যাদি সম্ভবত যথেষ্ট ছিল না। তারা অস্ত্র পেত ভারত সরকারের কাছ থেকে। কিন্তু অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় মানুষের বাড়িতে হানা দিত। ফাদারের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় তারা সিস্টারদের বাড়িতেও একবার হানা দিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। ফাদার আবেল বি রোজারিওর প্রথম মিশন ছিল বিড়াইডাকুনী। সেটি আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগের কথা। আমি খুশি যে, ফাদার আবেল এখনো শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্ত আছেন। উনার স্মৃতিশক্তি ভালো আছে। অনেকের নাম মনে আছে এখনো উনার। বিড়াইডাকুনী মিশনে যখন বার বার কাদেরিয়া বাহিনী আক্রমণ করছিল এবং ফাদারের জীবন অনিশ্চিত, তখন অনেকের পরামর্শে তিনি রাতে হালুয়াঘাট সেন্ট এন্ড্রুজ মিশনে এসে রাত কাটাতেন। দিনে বিড়াইডাকুনী মিশনে কাজ করে রাতে ঘুমাতে যেতেন হালুয়াঘাটে। সেখানে ফাদার চার্চ অব বাংলাদেশের রেভাঃ সুরেন্দ্র বাড়ৈ, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা কৃপা বাড়ৈ-এর কথা এখনো ফাদার আবেলের মনে আছে। যে কেউ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র ফেসবুক পেজ থেকে ফাদার আবেলের সাক্ষাৎকার দেখতে পারেন। ফাদার বুলবুল তাঁর সাক্ষাৎকার ধারণ করে ইতিহাসের পাতায় মূল্যবান সংযোজন করেছেন। মান্দিদের জীবনে ঘটে যাওয়া ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়েও তেমন কাজ হয়নি। রেভাঃ ফাঃ এডমন্ড ই গেডার্ট, সিএসসি একটি বই লিখেছেন "গারো অঞ্চলে কাথলিক মিশনারীগণ।" সুভাষ জেংচাম বইটি অনুবাদ করেছেন বাংলায়। এই বইয়ে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ফাঃ কমল কোড়াইয়া আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণে সামান্য আলোকপাত করেছেন এই সময় নিয়ে।

৪. এই কথাটি সত্য যে, গারো তরুণদের একটি বড় অংশ এই কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ফাদার আবেলের সাক্ষাৎকারে আছে, গারো তরুণদের তখন বিভ্রান্ত করা হয়েছিল এই প্রচারণা চালিয়ে যে, এই আন্দোলনে যোগ দিলে গারোদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়া হবে। এমনিতে সেই সময় আদিবাসী তরুণ সমাজ নানা কারণে হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে ছিল। তাছাড়া কয়েকবছর আগে টুয়াঙরে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সব মিলিয়ে গারো তরুণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশকে সীমান্তের ডাক টেনে নিয়ে গিয়েছিল । সেই সময় সরকার গারো নেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছেন ময়মনসিংহ শহরে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজে গারো নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আমি আমার বাবা সুহৃদ গাম্রাকে ২০০৪ সালে একটি ডায়েরী কিনে তাঁর জীবনের স্মৃতি লিখতে অনুরোধ করেছিলাম। বাবা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন প্রাইমারি ও হাই স্কুলে। আমার জানা মতে তিনিই একমাত্র গারো যিনি হালুয়াঘাট মডেল হাই স্কুলে চার বছর শিক্ষকতা করেছেন। পরে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনিয়ন পরিষদে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। তিনি পচাত্তর পরবর্তী সময়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ২ নং জুগলী ইউনিয়ন পরিষদে। বাবা তার ডায়েরীর একটি অংশে যা লিখেন, তার সারমর্ম এখানে তুলে ধরলাম। পচাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে গোধরাকুড়া গ্রামে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী বেনিভিক্ট প্রচারকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন জেনারেল জিয়া। কাদের বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্য গারো তরুণ। সীমান্ত এলাকায় আবার শুরু হলো অরাজকতা। রাতের বেলা গারোদের বাড়িঘরে লুটতরাজ শুরু হয়। আমাদের সংড়া গ্রামের বাড়িতেও দুই বার লুটপাট হয়। তৎকালীন বিডিআর প্রধান ব্রিগেডিয়ার কাজী গোলাম দস্তগীর ও

উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ ৮/১০ জন গারো নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া গারো নেতাদের তাগিদ দেন একটি কমিটি গঠনের। ১০/১২ বার মিটিং হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালে ময়মনসিংহ কাথলিক মিশনে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন গঠিত হয়। রেভাঃ ডি কে বনোয়ারী সভাপতি ও প্রমোদ মানখিন সাধারণ সম্পাদক হন।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার নিকট গারো নেতৃবৃন্দ মৌখিক কয়েকটি দাবি উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। দাবিগুলো ছিল,

১. ভূমি বিক্রি বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ট্রাইবাল চেয়ারম্যান ও কমিটির মাধ্যমে করা
২. সরকারি চাকুরিতে কোটা প্রদান করা
৩. কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে সাংস্কৃতিক একাডেমী গঠন করা
৪. রেডিওতে গারোদের জন্য অন্তত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্ধ করা
৫. উপজাতিদের জন্য পৃথক বাজেট প্রণয়ন করা
৬. সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ইত্যাদি চাকুরিতে কোটা প্রদান করা

সুহৃদ পাথ্রা লিখেন, প্রায় সকল দাবি সেই সময় সরকার মেনে নেন।

৫. সেই সময় ১৯৭৬ সালে আমি ক্লাশ ফাইভে পড়ি। বিড়ইডাকুনী প্রাইমারি স্কুলে। সংড়া গ্রাম থেকে তিন মাইলের বেশি পথ হেটে স্কুলে আসতাম। একদিন স্কুলে আসার পথে মনিকুড়া গ্রামে দুই গারো যুবকের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখেছিলাম একটি মাটির ঘরে। এখনো সেই স্মৃতি চোখে ভাসে। কেন এমন হয়? সেই সময়ের যথার্থ বিশ্লেষণ তো হয়নি আজো। সেই অস্থির সময়ে অনেক গারো তরুণ দেশ ছেড়েছিলেন। প্রজাপতির আগুনে ঝাপ দেওয়ার মতো। অনেকে আর দেশে ফেরেননি। নেদারল্যান্ডের অধ্যাপক এলেন বল তাঁর They ask if we eat frogs, Garo ethnicity in Bangladesh বইয়ে সেই সময়ের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, যা বিবাদপ্রী গ্রামের শিশিলিয়ার মুখে:

He (Kader) arrived in Haluaghat at night. There he fought with the police. After that he took shelter ith a Garo family in Gobrakura. The next day BDR entered our village, shouting: You Garos offered shelter to Kader. I was at home for the holidays. They came into the village and hit someone. We had no idea about Kader then."

অধ্যাপক এলেন বল এই সময়কে বলেছেন, Caught in the Firing Line শিরোনামে। লিখেছেন,

"Kader's arrival in northern Mymensingh created confusion among the Garos.

ফাদার আবেলের নাম উল্লেখ না করে এলেন বল লিখেন যে, ফাদার অসংখ্য গারো তরুণকে সুপারিশ করেন এবং তাদের অনেকে বিডিআর বাহিনীতে চাকুরিতে যোগ দেন। তাদের অনেকে কয়েক বছর আগেও চাকুরি করে অবসর নিয়েছেন। এত বিপুল সংখ্যক গারো আর কখনো বিডিআর বা অন্য কোনো বাহিনীতে একযোগে চাকুরি পাননি। সেই সময়েই বিরিশিরিতে একটি কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা এখনো কাজ করছে। ঢাকাস্থ রেডিওতে গারোদের জন্য সালগিত্তাল নামে একটি অনুষ্ঠান চালু হয় যার পরিচালক ছিলেন মাইকেল মৃত্যুঞ্জয় রেমা। ১৯৭৬ সালের ১১ এপ্রিল প্রথম রেডিওতে গারো ভাষায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সালগিত্তাল অনুষ্ঠান এখনো বাংলাদেশ বেতারে প্রতি শুক্রবার প্রচারিত হয়।

উপসংহার

ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও গারো সমাজ এগিয়ে চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গারোদের অগ্রগতি অন্য যে কোনো আদিবাসী সমাজের চেয়ে এগিয়ে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবেও গারোদের উন্নতি লক্ষণীয়। অন্যান্য আদিবাসী জাতির তুলনায় শহরে অভিবাসী গারোরা প্রতিযোগিতামূলক সমাজে টিকে থাকার ও এগিয়ে চলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনেকে সুনাম ও দক্ষতার সহিত কাজ করছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গারো ছাত্রছাত্রীদের পদচারণা স্পষ্ট দৃশ্যমান। দেশের বাইরে পড়াশোনা ও কাজে অনেকে রয়েছেন। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মান্দিদের উন্নতি আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে চলেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের পর থেকে ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছিল গারো সমাজ, তার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সম্মুখপানে এই ছুটে চলা অনেক জাতিকে প্রেরণা যোগাবে।

সহায়ক গ্রন্থ/কৃতজ্ঞতা:

১. গারো অঞ্চলে কাথলিক মিশনারীগণ, রেভাঃ ফাঃ এভমন্ড ই গোডার্ট, সিএসসি। অনুবাদ সুভাষ জেংচাম।

২. ঈশ্বরের সেবক থিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব, সংকলন ও সম্পাদনা সুনীল পেরেরা

৩. সালগিত্তাল প্রকাশনা, রেডিও বাংলাদেশ

4. They ask if we eat frogs, Garo ethnicity in Bangladesh, Dr. Ellen Bal, by International Institute for Asian Studies, Leiden, the Netherlands

(লেখক: কলাম লেখক ও সংস্কৃতি কর্মী। আইপিডিএস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের এক্সপার্ট সদস্য। নয়টি গ্রন্থের লেখক।)

Source

The irregular forces of Bangladesh Liberation War | The Daily Star

Source: Internet

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মুক্ত মানবতারই অঙ্গিকার

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত সহজ, সরল, ধর্মপরায়ণ এবং অতিথি পরায়ণ ও সার্বজনীন সম্প্রীতির বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত মহান এক জাতির নাম বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্টগত মহানুভবতার সুযোগ গ্রহণ করে, যুগে যুগে ভিনদেশী সুযোগ সন্ধানী মানুষ বাংলার মাটি স্পর্শ করে এর সুফল ভোগ করেছে। ব্যবসার নামে আগত ধূর্ত গোষ্ঠির ব্যবসায়ীরা, স্বার্থগত কৌশল অবলম্বন করে দেশের অভ্যন্তরে তারা কিছু সমর্থক সৃষ্টি করে নিয়ে তাদের কল্যাণে শিক্ষা, সেবা, চিকিৎসার হাত প্রসার করে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান গড়ে তুলেন এবং কর্মজীবিদের ওপর মনিবের স্থান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে! প্রাচীন ভারতবর্ষের অবিভক্ত বঙ্গদেশে আগমন করতঃ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের গোপন অভিসন্ধির মাধ্যমে নানা অপকৌশল প্রয়োগ করে, তারা বারো ভূঞাদের বঙ্গভূমি দখল করে নেয়। অতঃপর, প্রশাসনিক স্বার্থে সনাতনী সমাজে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও গোত্রের অভ্যন্তরে বিভিন্নমুখী বৈষম্য সৃষ্টি করে মানুষের মাঝে আভ্যন্তরীণ নানা কোন্দল ছড়িয়ে, অদৃশ্য ধূম্রজালে বারো ভূঞাদের স্বাধীন রাজত্ব গ্রাস করে নিয়েছিলেন বলে ইতিহাসের পাতায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিরক্ষর সমাজের নীরিহ সাধারণ মানুষ শিক্ষার আলোতে আত্মসচেতনতা লাভ করলে, নেতাজী সুবাস চন্দ্র বসুর মতো বিপ্লবী নেতা ও নতুন গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটে। পরাধীনতার গ্লানি মুছে দিতে মাকে দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য্য সেন, এ.কে. ফজলুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসুধন দত্ত, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, বিপ্লবী মনি সিং, ফনি ভূষণ মজুমদার, চারু মজুমদার, তাজউদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমানদের আবির্ভাবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অভিযান সফল হয়। ফলে, সর্বশেষ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সনের আগস্টে, প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুদের সংখ্যাগুরু এলাকাগুলো নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন ভারত। হীন মানসিকতার রাজনৈতিক ব্যর্থতায় বারোশত মাইলের ব্যবধানে, কেবলমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ব্যতিত বহুমাত্রক বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়েই গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। অতঃপর, পশ্চিমা শক্তির অপ-রাজনৈতিক কু-মতলব সফল করার প্রত্যয়ে, বাঙ্গালীর উপর ১৯৪৮ সন থেকেই প্রাথমিক আঘাত হানা হয়েছিলো রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে।

পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, ১৯৪৮ সনে ঢাকা সফরে এসে উর্দূকে রাষ্ট্রীয় দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রস্তাব করলে, তৎকালিন বিপ্লবী ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অতঃপর, প্রস্তাবটি পরিবর্তন করে, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে সংখ্যাগুরু মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদায় রেখে, কেন্দ্রিয় সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়। জাতির পিতা জিন্নাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করে তীব্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, "কেবলমাত্র উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।" তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদের ঝড়, তৎকালিন পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বয়ে যায়। কেন্দ্রিয় সরকার ছাত্র আন্দোলন দমিয়ে রাখার লক্ষ্যে তৎকালিন আওয়ামী মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিব সহ তাঁর সমর্থক কতিপয় সহযাগীকে কারারুদ্ধ করেন। ছাত্র নেতাদের মুক্তির দাবীতে বিপ্লবী ছাত্র সমাজ ঢাকার রাজপথে নেমে আসলে, ভাষা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার সচেতনতার আন্দোলন, পর্যায়ক্রমে ছাত্র রাজনীতিতে পরিণত হওয়ায়, তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-যুব সমাজের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইন্ধনদাতা হিসেবে বিরোধী দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের একাংশের নাম আওয়ামী লীগ নামে নতুন পরিচয় লাভ করে। সমর্থক ছাত্র সংগঠন হয়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ। ছাত্র রাজনীতির অবিরত ধারায় ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঢাকার রাজপথসহ দেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর দখল করে নেয়। অতঃপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র লীগের পাশাপাশি, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (চীনা পন্থী) মাওলানা ভাসানী এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদের (রাশিয়া পন্থী) ন্যাপ মিলে উভয় দলের অঙ্গ সংগঠন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া-মেনন) উপদলও রাজপথে ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো।

১৯৫২ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ অধিবেশন চলাকালে তৎকালিন জগন্নাথ হল সংলগ্ন সংসদ ভবনে, বাংলা ভাষার স্মারক পত্র পেশ করার দাবীতে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন আম গাছতলার সভা থেকে শোভাযাত্রা আরম্ভ করলে, সরকার নির্দেশিত ১৪৪ ধারাবলে, ২০শে ফেব্রুয়ারীর গণমিছিলে পুলিশ বাধা দেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ছাত্র-গণ মিছিল পুলিশের বাধা অমান্য করলে, জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ঢাকার রাজপথ বাঙ্গালীর তাজা রক্তে রাঙ্গিয়ে বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বার শাহাদাত বরণ করেন। ভাষার দাবীতে নিহত ছাত্রদের বিচার দাবী করে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ঢাকাসহ সারা দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হয়। সর্বজন

পরিচিত তৎকালিন দৈনিক মর্নিং নিউজ পুরাতন ঢাকার জুবিলী প্রেস থেকে প্রকাশ করা হতো। মর্নিং নিউজে ছাত্র আন্দোলনের প্রতিকূলে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায়, বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল জুবিলী প্রেসে আগুন দেয়। তাৎক্ষণিক আন্দোলন দমাতে পুলিশ দ্বিতীয় দিনেও আরো দু'জনের প্রাণ কেড়ে নেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি, বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর রক্ত ঝরানোর স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রত্যয়ে অতঃপর, দিনটি ঐতিহাসিক শহীদ দিবসে পরিণত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন আমতলায় পতিত ভাষা সৈনিকদের তাজা রক্তের স্মৃতিরক্ষায় গড়ে উঠে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার।

ভাষা আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করে ধর্মভিরু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মাসিক মুখপত্র "প্রতিবেশী" সম্পাদক ফাদার যাকব দেছাই, পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন, "জনগণের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিয়ে তাকে পঙ্গু করে রাখার অর্থ হলো গণ-স্বাধীনতা হরণ করা।" মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালিন কেন্দ্রিয় সরকার, অরাজনৈতিক খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুলকিত দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও বাঙ্গালী খ্রিষ্টান হিসেবে আত্মোপলব্ধি ও গর্বানুভব করতে থাকেন।

রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে দলের নাম পরিবর্তন করে, আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষায়, আওয়ামী লীগই হয়ে উঠে বাঙ্গালীর দল। আন্দোলনের গতিবিধি লক্ষ্য করে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল ঘোষণা করে, ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন, গোটা দেশে সামরিক আইন ঘোষণা করে, নিজেই সামরিক সরকার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রধান ফিরোজ খাঁ নূনকে ক্ষমতাচ্যুত করে, পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সুদীর্ঘকাল আয়ুবী শাসনের কারণে দেশব্যাপী শক্তিশালী বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়। আইয়ুব খান উন্নয়নের দশক পালন করলে, স্বৈরশাসনকে মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ দলীয় প্রধান এবং তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে, ৬-দফা ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্বায়ত্বশাসনের ইঙ্গিত বহন করায়, শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদির অপবাদে বারবার কারা বরণ করতে হয়েছে। ঘটনার জের টেনে, আওয়ামী লীগ পন্থী নেতা কর্মীসহ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের শীর্ষ নেতাদের বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। প্রবহমান ছাত্র আন্দোলনের ধারায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দেশের সর্বত্র ছাত্রলীগের বিজয় নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তৎকালিন "ডাকসু" সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ ১৯৬৯ সনে সর্বদলীয় আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হয়ে, আন্দোলনে তোফায়েল আহমদ জনতার নয়ন মনিতে পরিণত হলেন। দেশব্যাপী ছাত্র গণ-আন্দোলনে আইয়ুবী শাসনের পতন ঘটলে, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন সামরিক শাসন ঘোষণা করে পুনরায় পকিস্তানের শাসনভার ও ক্ষমতা কেড়ে নেন। ওদিকে শেখ মুজিবকে কোনঠাসা করে গণবিচ্ছিন্ন রাখার অপকৌশল হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। '৬৯ এর আন্দোলনে বাঙ্গালীর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারা মুক্ত করায় তথাকথিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেরাও বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে ১৯৭০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি, উদযাপন কালে দিবসটি বাঙ্গালী জাতির মহোৎসবে পরিণত হয়। ১৯৬৯ এ প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ঢাকার যুব সাংস্কৃতিক সংগঠন সুহৃদ সংঘ, দেশের স্বনামধন্য সুরশিল্পী ও বাদ্যকার সমর দাস, যোসেফ কমল রড্রিক্স, নিপু গাঙ্গুলি, ম্যাথিও দীপক বোসসহ উঠতি শিল্পীদের সংগঠিত শোভাযাত্রার সাথে নবগঠিত খ্রিষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ, ত্রিবেণী ছাত্র কল্যাণ সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন খ্রিষ্টমন্ডলীর ব্যানার বহন করে সাদা পোশাকের যাজক ও ব্রতধারীদের শোভাযাত্রা আজিমপুর গোরস্থানসহ কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার চত্বরকে মুখরিত করে তুলেছিলো। জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা এবং জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত শহীদ দিবস উদযাপন করার সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান বাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। শহীদ দিবস উদ্‌যাপন প্রমান করে দেয় ধর্মবিশ্বাস ব্যতিত স্বদেশী কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা মানুষের প্রয়োজনে অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম এবং জাতীয় ঐক্য প্রকাশের প্রধান উপাদান। ১৯৭০ সন পূর্ব পাকিস্তানীদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই বাংলায় কথা বলে এবং এরা সবাই বাঙ্গালী।

সৃষ্টিকর্তার বিধানে মানবসন্তান ভূমিষ্ট হতে নয়মাস, নির্ধারিত একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মহাপ্রলয় '৭০ এর ১২ নভেম্বর, উপকূল এলাকার ভোলা, সন্দীপ, জলোচ্ছাসে ভাসিয়ে, পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় এবং পকিস্তান সরকারের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের মনোভাব যাচাইয়ের সর্বশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় মহাপ্রলয়ে ধ্বংস সম্পর্কে গণমাধ্যম প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলো না বিধায়, জাতির নেতা কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই তাঁর প্রিয় দলের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে, ত্রাণ বিতরণ করে ঢাকায় ফিরে সাংবাদিকদের কাছে জলোচ্ছাসের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে ভয়াবহ দুর্যোগের বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হবার পরেও পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। দু'সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপ্রধান দুর্যোগদুল্ল পরিদর্শন করে ফিরে যাবার দিন, বিশ্ব ক্যাথলিক মন্ডলী প্রধান ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিশ্ব মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বিধায় ২৭শে নভেম্বর, আর্তমানবতার পক্ষে সমবেদনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমান বন্দরে ঘন্টাকালিন যাত্রা বিরতি ঘোষণা করেন।

পরিচিত তৎকালিন দৈনিক মর্নিং নিউজ পুরাতন ঢাকার জুবিলী প্রেস থেকে প্রকাশ করা হতো। মর্নিং নিউজে ছাত্র আন্দোলনের প্রতিকূলে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায়, বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল জুবিলী প্রেসে আগুন দেয়। তাৎক্ষণিক আন্দোলন দমাতে পুলিশ দ্বিতীয় দিনেও আরো দু'জনের প্রাণ কেড়ে নেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি, বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর রক্ত ঝরানোর স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রত্যয়ে অতঃপর, দিনটি ঐতিহাসিক শহীদ দিবসে পরিণত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন আমতলায় পতিত ভাষা সৈনিকদের তাজা রক্তের স্মৃতিরক্ষায় গড়ে উঠে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার।

ভাষা আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করে ধর্মভিরু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মাসিক মুখপত্র "প্রতিবেশী" সম্পাদক ফাদার যাকব দেছাই, পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন, "জনগণের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিয়ে তাকে পঙ্গু করে রাখার অর্থ হলো গণ-স্বাধীনতা হরণ করা।" মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালিন কেন্দ্রিয় সরকার, অরাজনৈতিক খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুলকিত দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও বাঙ্গালী খ্রিষ্টান হিসেবে আত্মোপলব্ধি ও গর্বানুভব করতে থাকেন।

রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে দলের নাম পরিবর্তন করে, আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষায়, আওয়ামী লীগই হয়ে উঠে বাঙ্গালীর দল। আন্দোলনের গতিবিধি লক্ষ্য করে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল ঘোষণা করে, ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন, গোটা দেশে সামরিক আইন ঘোষণা করে, নিজেই সামরিক সরকার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রধান ফিরোজ খাঁ নূনকে ক্ষমতাচ্যুত করে, পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সুদীর্ঘকাল আয়ুবী শাসনের কারণে দেশব্যাপী শক্তিশালী বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়। আইয়ুব খান উন্নয়নের দশক পালন করলে, স্বৈরশাসনকে মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ দলীয় প্রধান এবং তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে, ৬-দফা ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্বায়ত্বশাসনের ইঙ্গিত বহন করায়, শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদির অপবাদে বারবার কারা বরণ করতে হয়েছে। ঘটনার জের টেনে, আওয়ামী লীগ পন্থী নেতা কর্মীসহ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের শীর্ষ নেতাদের বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। প্রবহমান ছাত্র আন্দোলনের ধারায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দেশের সর্বত্র ছাত্রলীগের বিজয় নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তৎকালিন "ডাকসু" সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ ১৯৬৯ সনে সর্বদলীয় আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হয়ে, আন্দোলনে তোফায়েল আহমদ জনতার নয়ন মনিতে পরিণত হলেন। দেশব্যাপী ছাত্র গণ-আন্দোলনে আইয়ুবী শাসনের পতন ঘটলে, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন সামরিক শাসন ঘোষণা করে পুনরায় পাকিস্তানের শাসনভার ও ক্ষমতা কেড়ে নেন। ওদিকে শেখ মুজিবকে কোনঠাসা করে গণবিচ্ছিন্ন রাখার অপকৌশল হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। '৬৯ এর আন্দোলনে বাঙ্গালীর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারা মুক্ত করায় তথাকথিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেরাও বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে ১৯৭০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি, উদযাপন কালে দিবসটি বাঙ্গালী জাতির মহোৎসবে পরিণত হয়। ১৯৬৯ এ প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ঢাকার যুব সাংস্কৃতিক সংগঠন সুহৃদ সংঘ, দেশের স্বনামধন্য সুরশিল্পী ও বাদ্যকার সমর দাস, যোসেফ কমল রড্রিক্স, নিপু গাঙ্গুলি, ম্যাস্ট্রো দীপক বোসসহ উঠতি শিল্পীদের সংগঠিত শোভাযাত্রার সাথে নবগঠিত খ্রিষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ, ত্রিবেণী ছাত্র কল্যাণ সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন খ্রিষ্টমন্ডলীর ব্যানার বহন করে সাদা পোশাকের যাজক ও ব্রতধারীদের শোভাযাত্রা আজিমপুর গোরস্থানসহ কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার চত্বরকে মুখরিত করে তুলেছিলো। জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা এবং জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত শহীদ দিবস উদযাপন করার সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান বাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। শহীদ দিবস উদ্‌যাপন প্রমান করে দেয় ধর্মবিশ্বাস ব্যতিত স্বদেশী কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা মানুষের প্রয়োজনে অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম এবং জাতীয় ঐক্য প্রকাশের প্রধান উপাদান। ১৯৭০ সন পূর্ব পাকিস্তানীদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই বাংলায় কথা বলে এবং এরা সবাই বাঙ্গালী।

সৃষ্টিকর্তার বিধানে মানবসন্তান ভূমিষ্ট হতে নয়মাস, নির্ধারিত একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মহাপ্রলয় '৭০ এর ১২ নভেম্বর, উপকূল এলাকার ভোলা, সন্দীপ, জলোচ্ছাসে ভাসিয়ে, পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় এবং পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের মনোজগৎ যাচাইয়ের সর্বশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় মহাপ্রলয়ে ধ্বংস সম্পর্কে গণমাধ্যম প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলো না বিধায়, জাতির নেতা কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই তাঁর প্রিয় দলের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে, ত্রাণ বিতরণ করে ঢাকায় ফিরে সাংবাদিকদের কাছে জলোচ্ছাসের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে ভয়াবহ দুর্যোগের বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হবার পরেও পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। দু'সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপ্রধান দুর্যোগকবলিত পরিদর্শন করে ফিরে যাবার দিন, বিশ্ব ক্যাথলিক মন্ডলী প্রধান ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিশ্ব মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বিধায় ২৭শে নভেম্বর, আর্তমানবতার পক্ষে সমবেদনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমান বন্দরে ঘন্টাকালিন যাত্রা বিরতি ঘোষণা করেন।

দেশের প্রথম বাঙ্গালী আর্চবিশপ থিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলি সি,এস,সি, বিশপ মাইকেল রোজারিও এবং বিশপ যোয়াকিম ডি' রোজারিও সি,এস,সি ইতিমধ্যে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। খ্রিষ্টিয় জগতের মহান অতিথি পোপ ৬ষ্ঠ পৌলকে ঢাকায় সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানাতে পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণর আহসান ২৫ জন যাজক, ব্রতধারী এবং ২৫ জন সাধারণ খ্রিষ্টান নেতা নেত্রীকে আমন্ত্রণ জানান। স্থানীয় মণ্ডলীর পক্ষে ঢাকার ভিকার জেনারেল মন্সিনিওর পিটার এ গমেজ, লক্ষীবাজারের পাল পুরোহিত ফাদার পৌল গমেজ এবং রমনার পাল পুরোহিত ফাদার পৌলিনুস কস্তা (আর্চবিশপ) পোপ মহোদয়কে অভিনন্দন জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু এবং হিউবার্ট অরুন রোজারিও পোপ মহোদয়ের আগমনে স্বদেশী খ্রিষ্টান ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন।

২৭ নভেম্বর, ১৯৭০ রাত বারোটায়, পোপ মহোদয়কে তেজগাঁও বিমান বন্দরে, সামরিক সরকার প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় আইন বিষয়ক মন্ত্রী এ.আর. কর্ণেলিউসকে সাথে নিয়ে যীশু খ্রিষ্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি, পোপ ৬ষ্ঠ পৌলকে স্বাগত জানান। আল ইতালিয়া বিমান থেকে নেমে পোপ মহোদয় লাল গালিচায় দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান খ্রিষ্টান নেতা-নেত্রীদের সাথে করমর্দন করেন। অপেক্ষমান হাজারো জনতার উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ শেষে পোপ পৌল সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। দূর্যোগের সংবাদ সংগ্রহ এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে দৈনিক মতবিনিময় করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আশ্রয় নেয়া, প্রায় চারশত বিদেশী সাংবাদিক তখন ঢাকার শাহবাগ হোটেল, পূর্বাণী হোটেল ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান নিয়েছিলেন। দূর্গত মানুষের প্রতি সমবেদনা জানাতে এবং মানব সেবায় পোপ মহোদয়, রাষ্ট্র প্রধানের হাতে এক লক্ষ ডলারের একটি চেক প্রদান করেন, জনসেবার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজস্ব খ্রিষ্টান মণ্ডলীকে ও আরো এক লক্ষ ডলারের একটি চেক হস্তান্তর করলে, তাঁর ভ্রমণসাথী সাংবাদিকগণ নিজেদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা আরো পাঁচশত ডলার দান করেন। পোপ মহোদয় অধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষে সেদিন যে সকল মন্তব্য করেছিলেন তাতে দেশীয় খ্রিষ্টভক্তদের মনোভাব, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো বিধায়, আওয়ামী লীগের প্রতি সংখ্যালঘু খ্রিষ্টভক্তগণও বাঙ্গালী খ্রিষ্টানের স্বীকৃতি পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত পুলক অনুভব করেছিলেন। অতঃপর বাঙ্গালী খ্রিষ্টানদের সুপ্ত রাজনৈতিক চেতনা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সমর্থন দেয়।

১৯৭০ সনের জাতীয় নির্বাচনে বাঙ্গালী চেতনার সমর্থনে, অবহেলিত আদিবাসীরাও জন্মসূত্রে বাংলাদেশী প্রমানের সর্বশেষ সুযোগটি গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি আসনে, আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। নির্বাচনী ফলাফলে স্তম্ভিত সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করছে না বিধায় পুনরায় ছাত্র গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯৭১ এর ১লা মার্চ এর ভাষণে সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খান, নির্ধারিত তারিখে ৩ মার্চ ১৯৭১ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায়, দেশব্যাপী গণবিস্ফোরণ ঘটে। ২ মার্চ, ডাকসু আয়োজিত প্রতিবাদ সভায়, বিপ্লবী পতাকা উত্তোলন এবং ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের মহাসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা করার মধ্যদিয়ে ছাত্রলীগ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ ও পাঠ করে।

অতঃপর, ৭ মার্চ, রমনা রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় পাকিস্তান সরকার হতভম্ব হয়ে, জনতার আন্দোলন দমানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যত্রতত্র বেপরোয়া আঘাত হানতে থাকে। অতঃপর, ১৯ মার্চ, টঙ্গি-জয়দেবপুর এলাকায় চৌরাস্তায় বিপ্লবী জনতা বেরিকেড প্রস্তুতকালে, জনতার উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। সেনাবাহিনীর সাথে মল্লযুদ্ধ থেকে গোলাগুলি এবং ইপিআর বাহিনীর বাঙ্গালি সৈনিকগণ জনতার পক্ষধারণ করলে রাইফেলের গুলিতে ঘটনাস্থলে হুরমত আলি নিহত হন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে হুরমত শহীদ হলে জনতার আন্দোলনে বিস্ফোরণ ঘটে এবং আহত কানু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। অতঃপর মনু মিয়া, সন্তোষ মল্লিক ও নিয়ামত সেদিনের যুদ্ধে শহীদ হওয়ায়, ঢাকায় স্লোগান উঠে, "জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। আহত সৈনিকরা সেনানিবাসের বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় এলাকার জনমনে বিপ্লবী চেতনা শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর তৎকালিন বাঙ্গালী অধিনায়ক লে. কর্ণেল মাসুদুল হাসান তখন জয়দেবপুর সেনানিবাসে অবস্থান করছিলেন। ইউনিটসহ অধিনায়ক মেজর শফিউল্লাহ (সেক্টর কমান্ডর) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহবায়ক আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক গাদাবন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে মুক্তিযোদ্ধার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে ২৩ মার্চ, ছাত্রগণ মিছিল শোভাযাত্রা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে, বাংলাদেশের নতুন পাতাকা তুলে দেয়ায় সেদিনই সারা দেশের গ্রামগঞ্জে বিপ্লবী পতাকাটি উত্তোলন করা হয়।

অঘোষিত আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশে দেশ চলছে। ঢাকার তৎকালিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সমঝোতার নামে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, পশ্চিমাংশের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টু ও বঙ্গবন্ধুর বৈঠক চলছিলো। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ২৫ মার্চ, কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ ঢাকা ত্যাগ করেন। সেদিনই রাতের গভীর অন্ধকারে, নীরিহ সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তান বাহিনী

আঘাত হানে। একই সাথে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পিলখানায় ইপিআর বাহিনী এবং রাজারবাগ পুলিশ বাহিনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস ও নীরিহ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। রাত্রি দ্বি-প্রহরে ২৬ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা কালে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই সাথে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা করেন। সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে অগণিত মানুষ সে রাতে গণ শহীদে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ছাত্র যুবক ও কৃষক জনতা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে দেশের অভ্যন্তরে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গমন করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ২৭ মার্চ, "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" নামে বঙ্গবন্ধুর নামে ভ্রাম্যমান সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নেতা এবং সেনা সদস্য মেজর জিয়াউর রহমান, স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন।

অত:পর ৪ এপ্রিল: ১৯৭১, ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ তেলিয়াপাড়ায় মেজর খালেদ মোশাররফের অস্থায়ী দপ্তরে মিলিত হয়ে, কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানীর উপর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

২৯ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল, ইপিআর সদস্য জর্জ দাস, দিনাজপুরের দলছুট সৈনিকদের নিয়ে সাধারণ যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে, তারা পাঁচ ভাই মিলে জর্জ বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ইতিপূর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে স্বনামধন্য সুরশিল্পী সমর দাস সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তেভিড প্রণব দাস নিয়মিত অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল পাঠ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

নীরিহ সাধারণ মানুষের উপর পাক-বাহিনীর হামলায় সারা দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খ্রিষ্টান যুবকরাও ভারতে প্রবেশ করে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি পাক-বাহিনীর সর্বাধিক আক্রোশের কারণে অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মরক্ষা করতে স্বক্ষম হলেও সর্বক্ষেত্রে আশ্রয় শিবিরগুলো রক্ষা করা মিশনারীদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। শরণার্থী আশ্রয় শিবির পরিচালিত করতে গিয়ে ২১ এপ্রিল সর্ব প্রথম দিনাজপুর রুহিয়া মিশনের একজন জনপ্রিয় আদিবাসী যাজক ফাদার লুকাশ মারান্ডি পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন। ময়মনসিংহ জেলার বারোমারীতে লুর্দের রাণী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছিলেন সালেসিয়রান সম্প্রদায়ের ব্রতধারীনি ভাঃ সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল এস.এম.আই। ৮ জুন ব্যাংকে যাবার পথে রাস্তায় পুতে রাখা ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটলে তিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহে প্রাণ ত্যাগ করেন। যশোহরে কর্তব্যরত ইতালিয়ান ফাদার ম্যারিও ভেরনেসী যোদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দেবার অপরাধে রাজাকারদের সহযোগিতায় যশোহর শিমুলিয়া চার্চে পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন। মার্কিন যাজক ফাদার উইলিয়াম প্যাট্রিক ইভ্যান্স সি এস সি নবাবগঞ্জ থানাধিন গোল্লা ধর্মপল্লী এলাকায়, যোদ্ধাহত জনতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার অপরাধে নৌকাপথে যাত্রাকালে পাক-বাহিনী তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে ১৩ নভেম্বর গুলি করে এবং বেয়নেট চার্জ করে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করে।

ইতিপূর্বে, নিরীহ খ্রিষ্টভক্তদের মাঝে ঢাকা লক্ষীবাজার গির্জায় হিন্দু সাহায্য শিবিরে সেবাদানকারী তুমিলিয়ার পল কস্তা শিবিরে আশ্রয় প্রার্থীদের সাথে গণহত্যায় শাহাদাত বরণ করেন।

মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জন অবধি, বাঙ্গালি জাতি, বিপ্লবী বাংলায় জন্মগত কারণেই সকল গোত্রের আদিবাসীসহ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণীভেদহীন মহা বিপ্লব, সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উন্মাদনায় ত্রিশ লক্ষ নীরিহ জনতার রক্তবন্যায় ভেসে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঙ্গালির অনুভূতিতে দেশীয় খ্রিষ্টভক্তরাও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, গৌরবান্বিত ইতিহাস রচনা করেছেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর এদেশের নীরিহ হিন্দু সম্প্রদায়, আত্মরক্ষা করতে ঢাকার লক্ষীবাজার গির্জাসহ, ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা ভাওয়ালের নাগরী, তুমলিয়া, মঠবাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া, ধরেন্ডা এবং অপরদিকের শোলপুর, বান্দুরা, হাসনাবাদ, গোল্লা ও তুইতালে অরাজনৈতিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত খ্রিষ্টান গির্জা প্রাঙ্গণসহ অনেকের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাথমিক যাত্রায় প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলো বটে! অতঃপর, সরকার বনাম জাতির মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ বেধে যাওয়ায়, মুক্তিযুদ্ধ নামে এদেশের সর্বশ্রেণী ও গোত্রের মানুষ গণযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে পাক-বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম, ধর্মীয় স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানে অবিরত ধারায় অতর্কিত আক্রমণ চালায়। খ্রিষ্টমণ্ডলী মানবতার অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে, আর্তমানবতার সেবায় নীরিহ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর কারণে, পাক-বাহিনী আক্রোশ বশতঃ ধর্মযাজক, ব্রতধারীনিসহ সকল শ্রেণির সাধারণ খ্রিষ্টভক্তদের ওপর আক্রমন চালায়। আদমজী মিলে কর্মরত হিউবার্ট অনিল গমেজ, হাসনাবাদের এলবার্ট গমেজ শহীদ হলেন। লক্ষীবাজার শরণার্থীদের সাথে তুমিলিয়ার পল ডি' কস্তাকে তুলে নিয়ে যাবার পর, গণহারে হত্যাযজ্ঞে অনেকেই শহীদ হলেন। ধর্মযাজকদের মাঝে ২১ এপ্রিল সর্ব প্রথম শহীদ হলেন, দিনাজপুরের রুহিয়া মিশনে কর্মরত, আদিবাসী যাজক ফাদার লুকাশ মারান্ডি। ২৮ মার্চ, সম্মুখযুদ্ধে ইপিআর বাহিনী সদস্য জর্জ বাহিনীর লুইস দাস বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। এপ্রিলের শেষ নাগাদ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শেলবিদ্ধ হয়ে অদ্যাবধি পঙ্গু হয়ে আছেন। জর্জ দাস ও তার পাঁচ ভাই মিলে দিনাজপুর যুদ্ধে বীরত্বের প্রমান করেছেন।

ঢাকা চট্টগ্রাম রেল লাইনের দু'পাশে পুবাইল-আরিখোলা এলাকায় দড়িপাড়া, নলছাটা, ধনুন বান্দাখোলা, রাঙ্গামাটিয়া ও তুমিলিয়ায় বাঙালি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত জনবসতি রয়েছে। ট্রেনে বসে টহলরত পাক-বাহিনী যখন তখন কর্মরত মানুষের উপর গুলি চালিয়ে, কখনোবা গ্রামে প্রবেশ করে, বিভিন্ন সময়ে নীরিহ মানুষকে হত্যা করেছে। ডানিয়েল পালমা, কাইতানু রোজারিও, পলিকার্প রোজারিও, বিলু দরোজ, গাব্রিয়েল রোজারিও যোদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে পাক সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর, রাজাকারদের প্ররোচনায় দড়িপাড়ার জন রোজারিও (তেভার)র দুই ছেলে, কমল রোজারিও এবং নির্মল রোজারিওকে পাক-বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। নিরাপত্তাহীন খ্রিষ্টান যুবকরা শেষ অবধি বাধ্য হয়েই, মাতৃভূমিকে রক্ষার তাগিদে ভারতে আশ্রয় নিয়ে, বিভিন্ন দুর্গে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকায় পাঞ্জাবীদের আঘাত দমাতে, ভাওয়ালের সাধারণ মানুষ ২৫ নভেম্বর, সেনাবাহিনীর অবাধ গতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দড়িপাড়ার রেলসেতু ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান বাহিনী ট্রেনে বসে দড়িপাড়ার পুল থেকে আসকরের বাড়ি পর্যন্ত উপড়ে ফেলা রেল লাইন পার হতে না পারায় যাত্রাভঙ্গ করে, গন্তব্যপথ পরিবর্তন করে এবং জনতার চিহ্নিত গতিপথ লক্ষ্য করে ফিরে যায়। পরের দিন দুপুর নাগাদ কয়েকশত সৈনিক পশ্চিমে দড়িপাড়া ও পূর্বদিক থেকে একসাথে পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে অনুপ্রবেশ করে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র ২৯ জন। সাহসী বীর সুনীল ইগ্নেসিউস ডি' কস্তা, ক্লেমেন্ট কস্তা গুঞ্জা, এন্ড্রু ডি' কস্তা, শান্ত বেঞ্জামিন রোজারিও, মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ডানিয়েল ডি' কস্তা, কীরণ পেট্রিক রোজারিও, নরোত্তম বণিক, সুনীল ডি' ক্রুজ, দেলোয়ার হোসেন, আফজাল হোসেন খসরু, হুমায়ুন কবীর, চিত্তরঞ্জন দাস (অনিল)দের গেরিলা হামলায় বিমান বাহিনী আকাশ পথে আক্রমণ চালালে নিরুপায় মুক্তিযোদ্ধাগণ গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সেদিনের যুদ্ধে রাঙ্গামাটিয়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যালয় তছনছ করে পাকিস্তানীরা রাঙ্গামাটিয়া, জয়রামবের, ছোট সাতানিপাড়া গ্রামে আক্রমণ চালায়। কয়েক ঘন্টার সন্ত্রাসী হামলায়, কেবল রাঙ্গামাটিয়া গ্রামেই ১৩৭টি বাড়ী অগ্নিদগ্ধ করে ১৭ জনকে হত্যা করে এবং ১৪ জনকে আহত করে।

রাঙ্গামাটিয়ায় পাঞ্জাবীদের গুলিতে শহীদ হলেন, অনিল ডি' কস্তা, ডাঃ পিটার ডি' কস্তা, আন্না পালমা, কেতু রড্রিক্স, পল রড্রিক্স, আকালী রড্রিক্স, গেদু ডি' কস্তা, পাঁচা ডি' কস্তা, জিতা রোজারিও, ফ্রান্সিস রড্রিক্স, ফেলু ডি' কস্তা, রজা ডি' কস্তা, মাইকেল গমেজ, শৈলবালা বিশ্বাস এবং একই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা অন্যত্র যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন রবি ফ্রান্সিস ডি' কস্তা, রেজিনান্ড গমেজ (অনিল)।

নরসিংদীর ভোলাবো স্কুলে, পরিমল ডি' কস্তার নেতৃত্বে ছিলেন গিলবার্ট গমেজ, সুনীল স্ট্যানলী কস্তা, বিধান কমল রোজারিও, অতুল কস্তা, নরেন্দ্র কস্তা, পাত্রসিউস পালমা ও আগস্টিন পেরেরা। পাক-বাহিনীর অতর্কিত হামলায় অন্যান্যরা পালিয়ে বাঁচলেও মঠ বাড়ীর আগস্টিন পেরেরা সেন্ট্রির দায়িত্ব পালনকালে ধরা পড়েন। তাকে নরসিংদীর ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের পর কোন তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বিধায় গুলি করে হত্যা করা হয়। একই বাড়ির বাবুল পেরেরা কাঞ্চনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। নাগরী ধর্মপল্লীর করান গ্রামবাসী আন্তনী পিউরিফিকেশন অস্ত্র জমা দেবার জন্য ঢাকা এসে শহীদ হন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় ৩৪টি কোম্পানী পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। প্রায় সব কটি কোম্পানীতে গারো খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। কোম্পানী কমান্ডার দিপক সাংমা, প্লাটুন কমান্ডার স্টিফান নকরেক, প্লাটুন কমান্ডার তরুণ ডি সাংমা, চড় বাঙ্গালিয়ার কোম্পানী কমান্ডার উইলিয়াম ম্রং, প্লাটুন কমান্ডার অনুপ লিও, ধলাপানির প্লাটুন কমান্ডার জার্মেস চিসিম, প্লাটুন কমান্ডার তরুণ দারিং, বিভিন্ন এরাকায় যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলে পিছু হটার সময় পরিমল দ্রং রাজাকারের হাতে ধরা পড়েন এবং পাক-বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গোপালগঞ্জ কোটালিপাড়ার কোম্পানী কমান্ডার জেমস আর.কে. হাজরা, সুশীল চন্দ্র হাজরা, নির্মল চন্দ্র হাজরা, পিটার বাড়ৈ, সামুয়েল মুখটি, এলবার্ট মুখটি, আবেল বৈদ্য, মাইকেল গোপাল চন্দ্র বাইন, গিলবার্ট নির্মল বাইন, লুইস বাড়ৈ, সুধারঞ্জন রায়, জেমস সরকার, ডেভিড বিশ্বাস, চন্দ্রঘোনার সিমস কে. বাড়ৈ, রবার্ট পিন্টু বাড়ৈ, এন্ড্রিও বাড়ৈ, বরিশালের জন বোস, যোনাস ঢাকী, ফ্রান্সিস ঢাকী, রাফায়েল ব্যাপারী, দীলিপ ব্যাপারী, দিলীপ বৈদ্য, ডেভিড পি বৈরাগী, পাবনার আদম ডি' কস্তা, জেমস দাস ঝুটন, ইউজিন গমেজ, ওয়াল্টার ডি' কস্তা, নাটোরের উলিয়াম অতুল কুলন্তনু, সুবল এডুয়ার্ড রোজারিও, সিলভেষ্টার ডি' কস্তা, সুবল এল. রোজারিও, নোয়াখালির নির্মল মজুমদার, লুকাস কুইয়া যুদ্ধে মহান বীরের ভূমিকা পালন করেছেন।

এছাড়াও নাম না জানা অনেকেই শহীদ হয়েছেন। বীরাঙ্গণাও রয়েছেন অনেক, যারা সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় তা প্রকাশ করেননি। সীমান্ত এলাকার সকল ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়েছে। বাদ পড়েনি লালমনিরহাট, বনপাড়া, নাটোরসহ অনেক এলাকায় ক্ষতির ফসল আমাদের মহান বিজয় ও স্বাধীনতা, যা আমাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে।

উপসংহারে বলতে চাই, মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে অগণিত মানুষের বাসস্থান ও ঘনিষ্ঠজনদের। সন্তান হারা মায়ের কান্না, স্বামীহারা স্ত্রীর নয়নাশ্রু, পিতা-মাতা হারা সন্তানের বেদনায়, অর্জিত বাংলাদেশ কখনোই কোন বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র বা ধর্ম সম্প্রদায়ের একক কৃতিত্ব নয়। এ বিষয়টি নিয়ে শক্তিশালী ভাষায়, নবগঠিত

স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ খ্রিস্ট ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ

এলয়সিয়াস মিলন খান

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অনন্য স্মরণীয় ইতিহাস। এ মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাঙ্গালী জাতি দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক - প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। তৎকালিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে তাদের সমান ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে উপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে বাঙ্গালীদের ওপর শাসন-শোষন চালাতে থাকলে তার প্রতিবাদে আন্দোলনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অমর হয়ে লেখা থাকবে তাঁদের মধ্যে অন্যতম মিশনারী শহীদ ফাদার উইলিয়াম পি. ইভান্স, সিএসসি, ফাদার মারিত্ত ভেরোনেসি, এস.এক্স, ও সান্তাল আদিবাসী অমর শহীদ ফাদার লুকাস মারান্ডি।

অমর শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স :

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৩ নভেম্বর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য যখন উদয়ের পথে ঠিক সেই সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক-বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভক্তের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ শহীদ **ফাদার** ইভান্স অকুতোভয়ে হাসিমুখে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেন।

জন্ম, শৈশব ও কৈশোর :

ফাদার বিল ইভান্স ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেট্স অংঙ্গরাজ্যের পিটস্‌ফিল্ড এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতার নাম চার্লস ও রোজ ইভান্স। তিন ভাই বিল, চার্লস ও জন । এদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। শৈশবকাল থেকেই বিল ছিলেন খুবই মেধাবী ও খেলা-ধুলায় পারদর্শী। নিজ জন্মস্থান পিটস্‌ফিল্ড প্রাইমারী ও প্রাথমিক স্কুলে পড়াশুনার শুরু থেকেই বালক বিল -এর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলায়ও বালক বিল দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষ করে বাস্কেটবল ও হকি খেলায় এলাকায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। একই সঙ্গে বিল নেতৃত্বদানেও দক্ষতার পরিচয় দেন। বালক বিল -এর নেতৃত্বদানে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে ৩ বছরের জন্যে তার ক্লাশের মনিটরের দায়িত্ব প্রদান করেন।

ধর্মীয় জীবনে আহ্বান ও গঠন প্রশিক্ষণ :

কিশোর বিল -এর গুনাগুনে আকৃষ্ট হয়ে উত্তর ইষ্টার্নে অবস্থিত আওয়ার লেডি অফ্ হলি ক্রশ সেমিনারীর পরিচালক ফাদার জেরাল্ড ফিটস্ জেরাল্ড তাকে পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমন্ত্রণ জানান। সময়টি ছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের হেমন্তের ছুটি। এই সেমিনারীটি বর্তমানে স্টোরহিল কলেজ নামে পরিচিত। বিল দুই বছর এই সেমিনারীতে অবস্থান করেন। সেমিনারীর প্রার্থনাপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার জীবনে আকৃষ্ট হয়ে বিল সেমিনারীতে প্রবেশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর *'এসো আমাকে অনুসরণ করো'* প্রভুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি গঠনশালায় যোগদান করে নিজেকে পূর্ণতার পথে পরিচালনার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী হন।

নব্যাশ্রমে যোগদান :

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উইলিয়াম ইভান্স উত্তর ডার্টমাউথ-এ অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ নব্যাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং এক বছরের প্রশিক্ষণ শেষে ১৬ আগস্ট দারিদ্র্য, কৌমার্য ও বাধ্যতার প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। নব্যাশ্রমের প্রশিক্ষণান্তে তিনি মরো সেমিনারীতে পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী চার বছর তিনি ঐশ্বশাস্ত্র ও মিশনশাস্ত্র নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত হলি ক্রশ ফরেন মিশন সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশের পাঁচ বছর পর তিনি সংঘের শেষ ব্রত গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁকে যীশুর পবিত্র ক্রুশ প্রদান করা হয় যা তিনি যীশুর প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আজীবন বক্ষে ধারণ করেছেন। পরিধান করেছেন শুভ্র পোষাক।

যাজক ইভান্স :

১০ জুন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটন ডিসিতে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত কলেজিয়েট পবিত্র হৃদয় গির্জায় তাঁকে যাজকপদে অভিষিক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ভাটিক্যানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ এমলেতো তাঁকে যাজকপদে অভিষিক্ত করেন।

ঢাকায় আগমন :

যাজক বিল প্রৈরিতিক কাজে যোগদানের জন্য ছিলেন খুবই আগ্রহী। তাই যাজকত্ব লাভের পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি পূর্ব বাংলায় আসার পরিকল্পনা করেন। তিনি ২০ নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ বাল্টিমোর থেকে জাহাজযোগে রওনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফাদার গ্রেগরী ষ্টেকমায়ার, এডমন্ড গেডার্ড, রবার্ট ওয়েকুলিস ও ফাদার লুইস মায়ার। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা শেষে তাঁরা ডিসেম্বরের শেষে ভারতের মাদ্রাস শহরে পৌঁছান। অতঃপর কোলকাতা হয়ে তাঁরা ঢাকায় পৌঁছান।

মিশন কাজের শুরু :

যাজক ইভান্সকে প্রথম দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশের আঠারগ্রাম অঞ্চলের এক নিভৃত পল্লী তুইতাল পবিত্র আত্মার ধর্মপল্লীতে। এক বছর তিনি তুইতাল ধর্মপল্লীতে অবস্থান করে যাজকীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ফাদার এডুয়ার্ড ওয়েজেল-এর কাছে বাংলা ভাষা শিখেন। অতঃপর তাঁকে নতুন দায়িত্ব দিয়ে ময়মনসিংহের বিড়য়ডাকুনী ধর্মপল্লীতে প্রেরণ করা হয়। এখানে তিনি সাত বছর পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন। ধীরে ধীরে তিনি একজন অভিজ্ঞ মিশনারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অত:পর তিনি পর্যায়ক্রমে (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) কালীগঞ্জ অঞ্চলে তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, সিলেটের চা-বাগান, লক্ষ্মীবাজার হলি ক্রশ ক্যাথেড্রাল, বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক, বালুচরা মিশন ও সর্বশেষ কর্মস্থল গোল্লা ধর্মপল্লীতে পালক পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ইভান্সকে গোল্লা ধর্মপল্লীতে পালক নিযুক্ত করা হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ও অকৃত্রিম ভালবাসায় অচিরেই তিনি এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে একজন জনপ্রিয় পুরোহিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৭১-এ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। একজন ন্যায়পরায়ণ পুরোহিত হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিজেকে নিবেদন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তিনি স্থানীয় অসহায় ও নিরিহ মানুষের পার্শে অবস্থান গ্রহণ করেন, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের আশ্রয় দান করেন, নিরাপত্তা প্রদান করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেন, ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা দান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য স্থানীয় রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্যরা এ-সমস্ত তথ্য স্থানীয় পাক-বাহিনী ক্যাম্পে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সাহসী পালক ইভান্স যুদ্ধকালিন এই ভয়াবহ সময়েও তাঁর মানবীয় দায়িত্ব পালনে পিছু পা হননি এবং প্রাণপ্রিয় ভক্তদের জন্য তাঁর পালকীয় দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে ১৩ নভেম্বর, শনিবার অপরাহ্নে ফাদার ইভান্স তাঁর নিজস্ব মহন মাঝির নৌকায় ইছামতি নদী বেয়ে বক্সনগর রওনা হন। গোল্লা থেকে নদীপথে বক্সনগর গ্রাম প্রায় ৬ কি.মি.। নৌকাটি মাঝপথে নবাবগঞ্জ পাইলট হাই স্কুলে পাক-সেনাদের ক্যাম্পের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নদীর পাড়ে টহলরত পাক-সেনারা মাঝিকে নৌকা থামিয়ে পাঁড়ে ভিড়াতে বলে। মহন মাঝি নৌকা থামায়। নৌকার ভেতর একজন পাদ্রি সাহেবকে দেখে তাঁকে তারা স্কুলে অবস্থিত ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আর দুইজন পাক-সেনা নৌকার ভেতর প্রবেশ করে নৌকা তল্লাশী করে। ক্যাম্পের ভেতর প্রায় ১৫/২০ মিনিট তারা ফাদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর ফাদার যখন নৌকার দিকে ফেরত আসছিলেন তখন তারা মহন মাঝিকেও নৌকা থেকে নামিয়ে এনে ফাদারের সাথে নদীপাড়ে একটি গর্ত (ট্রেন্স)-এ নামতে বলে। মহন মাঝি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে রুদ্রশ্বাসে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফাদারকে পাক-সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ ইছামতি নদীতে ফেলে দেয়।

বক্সনগরনিবাসী কয়েকজনের সাথে আলাপ করে জানা যায় সম্ভবত পাক-সেনাদের ফাদারকে হত্যার কারণ, তাঁর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা। ঐ সময় বক্সনগর স্কুলভিঁটার মিশনারী স্কুলে মুক্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। কমান্ডার সিরাজ আহমেদের তত্ত্বাবধানে সেখানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শাহ্জালাল ও ইপিআর-এর আনোয়ার। যারা এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রিচার্ড মুকুল গমেজ, সিলভেস্টর বিকাশ গমেজ, মার্টিন সত্য গমেজ, গিলবার্ট অনু গমেজ, চার্লস সুবল গমেজ প্রমুখ। নবাবগঞ্জ থানার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল বক্সনগর গ্রামে এই তথ্য পাক-বাহিনীর জানা ছিল।

পরদিন ভোরে স্রোতস্বিনী ইছামতি নদীর ভাটিতে নবাবগঞ্জ থেকে প্রায় ৩ কি.মি. পূর্বে কোমরগঞ্জ এলাকায় জেলেদের মাছ ধরার ঘেরে ফাদারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেখান থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মৃতদেহ উদ্ধার করে কোমরগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গনে নিয়ে আসেন। মসজিদ থেকে কয়েকজন মুসলিম ভাই ফাদারের মৃতদেহের খবর গোল্লা মিশন ও বক্সনগর গ্রামে পৌঁছে দেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ফাদারের মৃতদেহ তুষায় বহন করে গোল্লা মিশনে নিয়ে আসেন। প্রথমে ফাদারের মৃতদেহ কোমরগঞ্জ থেকে নৌকা করে বিলের মধ্য দিয়ে গোবিন্দপুর নিয়ে আসেন, গোবিন্দপুর থেকে কাঁধে বহন করে মিশনবাড়িতে নিয়ে আসেন।

১৪ নভেম্বর বিকেল ৪টায় খ্রিষ্টযাগ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান শুরু হয়। গির্জাঘরের ভেতর, বারান্দা ও বাইরের চত্বরে অগণিত ভক্তগণ উপস্থিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় ফাদারকে শেষবিদায় জানাতে সমবেত হন। সবারই চোখ-মুখে ভয়-আতঙ্কের ছায়া। অনেকের ধারণা ছিল হয়ত: পাক সেনারা গির্জা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু খুবই শান্ত, সৌম্য নীরবতায় খ্রিষ্টযাগ শুরু হয়। তৎকালিন মহামান্য আর্চবিশপ থিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর অনুরোধে ফাদার হিকেন্স প্রধান পুরোহিত হিসেবে খ্রিষ্টযাগে পুরোহিত্য করেন। অন্যান্য পুরোহিত যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন: ফাদার মিথালেক, ফাদার সলোমন, ফাদার উর্বান কোড়াইয়া ও ফাদার মজুমদার। বান্দুরা হলি ক্রশ হাই স্কুল থেকে ব্রাদারগণ, গোল্লা ও হাসনাবাদ কনভেন্টের সিস্টারগণ বেদীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তজনগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খ্রিষ্টান, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও যারা তাদের প্রাণের মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আর্চবিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশে চমৎকারভাবে যাজক ইভান্সের ধার্মিকতা ও ভালবাসাময় ব্যক্তিত্ব তোলে ধরেন। তিনি যাজক ইভান্স-এর অসাধারণ মানবপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যারাই যাজক ইভান্সের সান্নিধ্যে এসেছে সবাইকেই তিনি গভীর আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, *"His sincere, warm, personal interest in all of us is what brings us all here together in*

appreciation, respect and thankfulness to him".

এভাবেই তাঁকে সমাধিতে চির শান্তিতে শায়িত করা হয়। তখন প্রকৃতিতেও শোকের ছায়া নেমে আসে। ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তমিত হয়। গির্জার সন্ধ্যা ঘণ্টা বেজে উঠে। শত শত ভক্তজন মোমবাতি জ্বেলে কবরের পার্শে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় রত হন। একজন পবিত্র মানুষ, বড় ফাদার ও অমর শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁকে গোল্লা গির্জার সমাধিস্থলে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জার প্রথম পালক ফাদার ফ্রান্সিস, সিএসসি -এর সমাধি পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। গোল্লা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের জন্যে যাজক ইভান্স ছিলেন তাদের একজন প্রকৃত বন্ধু, একজন আদর্শ পালক, একজন শহীদ সাক্ষ্যমর।

অমর শহীদ ফাদার ইভান্স ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ - তাঁর মৃত্যুঅবধি গোল্লা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী ও বক্সনগর সাধু আন্তনীর উপধর্মপল্লীর দায়িত্ব অতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন। গোল্লা ধর্মপল্লী ও বক্সনগর উপধর্মপল্লীসহ গোটা আঠারোগ্রাম এলাকার আপামর জনগণ চিরদিন তাঁকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণে রাখবে। তাঁর অমর স্মৃতি স্মরণে গোল্লা গ্রামের গির্জাসংলগ্ন রাস্তাটি শহীদ ফাদার ইভান্স সড়ক নামে নামকরণ করা হয়েছে। ফাদার ইভান্সের স্বপ্ন ছিল বক্সনগর গ্রামে শিশুদের জন্যে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে বক্সনগর গ্রামবাসী তাদের পুরাতন গির্জাঘরে শহীদ ফাদার ইভান্স কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেছেন। হলি ক্রশ সিস্টারদের পরিচালনায় এই কিন্ডারগার্টেনে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ জন। শিক্ষক ৬ জন -বলেন প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার ম্যাগডালিন যমুনা গমেজ সিএসসি ।

শহীদ ফাদার মারিও ভেরোনেসি :

যারা মানুষকে ভালবেসে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশের মুক্তি এনেছিলেন, তাদের কথা ইতিহাস স্মরণ করবেই। এমন একটি মানুষের কথাই এখানে লেখা হয়েছে। তিনি আর কেউ নন, শিমুলিয়া প্যারিসের পালক পুরোহিত ফাদার মারিও ভেরোনেসি। তিনি ১৯১২ খ্রিঃ ইটালীর রোভেরেটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে পুরোহিত হবার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে জাভেরিয়ান মিশনারী সমাজে প্রবেশ করেন। ১৯৫৩ খ্রিঃ ১৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেন। কিছু বছর খুলনা ধর্মপ্রদেশে, বিশেষভাবে সেন্ট যোসেফ ধর্মপল্লীতে দায়িত্ব পালন করে ১৯৬৭ খ্রিঃ পালক পুরোহিত হয়ে শিমুলিয়া আসেন। সততা ও ধার্মিকতার কারণে তিনি খুব শীঘ্রই দরিদ্র মানুষের কাছের মানুষে পরিণত হন। শিমুলিয়াবাসীদের দুঃখমোচন করার জন্য সমবায় সমিতি, ঋণদান সমিতি, ভিনসেন্ট ডি পল, তাঁতশিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতিকল্পে অর্থাৎ সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করেন, স্থাপন করেন প্রাইমারী স্কুল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। চারদিকে চিৎকার, মারামারি, শ্লোগান আর গোলাগুলির শব্দ। একদিকে সশস্ত্র পাকিস্তানী সৈনিক অন্যদিকে নিরস্ত্র সাধারণ জনতা। ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের পথে পাড়ি জমায়। আবার যারা যেতে পারে নি তারা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় সর্বস্বান্ত, বুভুক্ষু মানুষের একটি দল মিশন প্রাঙ্গণে হাজির হয়। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান মহাপ্রাণ ফাদার মারিও ভেরোনেসি। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় অস্থায়ী ক্যাম্প। সাধারণ মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়ার জন্য তার সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। সে সময়ে তার যা সামান্য অর্থ সম্বল ছিল তার সবটুকু তাদের জন্য অকাতারে বিলিয়ে দেন। অসুস্থদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করেন। সর্বোপরি তিনি রাতদিন ঐ শরণার্থীদের মাঝে সাহস জুগিয়ে, তাদের মনকে চাঙ্গা করে রাখেন । প্রতিটি পরিবারের কাছে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী হন। দিনের পর দিন নতুন নতুন মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। কাজের পরিধিও বাড়তে থাকে। তবুও ফাদার ভেরোনেসির মুখে একটুও ক্লান্তির ছাপ নেই। শান্ত সৌম্যমূর্তি তিনি। সবার কাছে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি। এরই মধ্যে ফাদার মারিও ভেরোনেসি যশোরে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন। সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ পাকসেনাদের হাতে আহত-নিহত হচ্ছে। তাদের সেবা দরকার। পাশে পান নির্ভরযোগ্য ফাদার ভ্যালেরিয়ান কব্বে-কে। মিশনের জিপে চড়ে দু'জনে যাত্রা করেন যশোরের পথে। রাস্তায় ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ। দূর থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। ফাদার কব্বে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গুলির শব্দ অনুসরণ করে ফাদার মারিও কেন জানি ফাদার কব্বেকে আড়াল করে রাখছিলেন। যদি কোন গুলি আসে তা যেন ফাদার কব্বের গায়ে না লাগে। নিজের ভাইকে রক্ষা করার এ এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

সেদিন ছিল ৪ এপ্রিল। খ্রীষ্টভক্তদের নিকট একটি পবিত্র দিন, তালপত্র রবিবার। এ দিনটি পুণ্য সপ্তাহের প্রথম দিন, বাইবেলে বর্ণিত আছে, মহান রাজা যীশু গাধার পিঠে চড়ে এদিন জেরুসালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। ফাদার মারিও ভেরোনেসি সিষ্টারদের কনভেন্টে মিসা দেন। মিসাশেষে রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সদর হাসপাতালের অবস্থা তখন খারাপ। রোগীদের সেবা দূরে থাক জীবন ভয়ে সবাই পালিয়ে যাচ্ছিল। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী বাহিনী অবিরাম গোলা ছুঁড়ছিল। পাকিস্তানী সৈন্যদের গোলার আঘাতে আহত মানুষদের যশোর ফাতিমা হাসপাতালে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শেষদিকে একজন মহিলা রোগীকে নিয়ে আসেন এম্বুলেন্সে করে। নিজের হাতে রোগীকে সেবাযত্ন করেন। এরপর হাতমুখ ধোয়ার জন্য একটু বাইরে আসেন যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। তখন বিকাল ৫টা। হাসপাতালের দিক থেকে কয়েকজন পাক-সেনা মিশনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফাদার ভেরোনেসি তখন বাবুর্চিখানা থেকে বের হতে যাচ্ছেন। এমন সময় খানসেনাদের রাইফেল গর্জে ওঠে। একজন সেনা ফাদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটি